

বর্গমালা

CELEBRATING BENGALI ART AND CULTURE

2024





Publisher:

XYZ

**On behalf of OIKYOTAAN, National Institute of Technology,
Silchar**

ISBN: XYZ

© OIKYOTAAN, National Institute of Technology, Silchar

Published on: XYZ

Price: Rs.XYZ

Printed at:
XYZ



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर
National Institute of Technology Silchar
(राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
(An Institute of National Importance) असम / Assam-788010

फोन/Phone : (03842) 224879
फेक्स/Fax : (03842) 224797

वैब/Web : <http://www.nits.ac.in>
ई पी ए बी एक्स/EPABX : 233841-5100/5101

E-mail: director@nits.ac.in

प्रो. दिलीप कुमार बैद्य / Prof. Dilip Kumar Baidya
निदेशक / Director



DO. No. NITS/PA/310/

शुभेच्छा बार्ता

प्रकृतिर चिरायत नियम मेने पुरनो दिनेर यापित जीवनेर स्मृतिके फेले आज आमरा नववर्षेर प्रारम्भे। एनआईटी परिवारेर सकल शिक्षक-शिक्षार्थी, कर्मकर्ता-कर्मचारी एवं तादेर परिवारवर्गेर सकलेर सुस्वास्थ्य ओ सुख-समृद्धि कामना करछि। नतुन बछरेर शुरुते सवार आगामी दिनगुलो आरो सुन्दर ओ सार्थक करे तोलार स्वप्निल आकाङ्क्षाके स्वागत जानाई।

आशा राखि, वस्तीय पञ्जिकावर्ष १४७१ ए एनआईटी शिलचरेर प्रतिटि सदस्य आरो उद्भावनी एवं गवेषणामुखी हये उठबे; प्रतिष्ठानेर प्राण शिक्षार्थीरा तादेर प्रातिष्ठानिक अध्ययनेर पाशापाशि सुसंस्कृतिर चर्चाय निजेदेर व्यस्त रेखे सुष्ठु प्रतिभार उन्मेष घटाबे।

जीर्णप्राण अतीतके भुले, विगत दिनेर भुल थेके शिक्षाटुकु निये नतुन दिनेर नतुन प्रत्यये एक आलोकित आगामीर प्रत्याशा!

विगत दिनेर धारावाहिकताय एनआईटी शिलचरेर शिक्षक-शिक्षार्थीरा बाङ्ला नववर्ष उदयापनेर निमित्ते "ऐक्यतान' ७१" आयोजन करते याछे जेने आमि आनन्दित।

प्रतिष्ठान परिचालक (डिरेक्टर) हिसेबे आमि ऐक्यतान'७१ एर सर्वाङ्गीण सफलता कामना करछि एवं संश्लिष्ट सकलके एमन वर्णिल आयोजनेर उद्योग ग्रहणेर जन्य साधुवाद जानाई। जातिगत वैचित्र्यता भुले ऐक्यतान हये उठुक सकल शिक्षार्थीर नववर्ष वरणेर उन्मुक्त प्राप्ति!

ऐक्यतानेर वीणार सुरे सकलेर जन्य रहिलो एकसाथे थाकार शुभकामना। नतुन बछरेर दिनगुलोते नित्यनतुन उद्भावने सुन्दर समय काटुक सकलेर। नववर्षेर शुभकामनाय मङ्गल होक सवार।

दिलीप कुमार बैद्य

अध्यापक दिलीप कुमार बैद्य/ Prof. Dilip Kumar Baidya

निर्देशक/ Director

National Institute of Technology Silchar

MESSAGE FROM FACULTY IN-CHARGE

ঐক্যতান ১৪৩১ দেখতে দেখতে চতুর্থ বছরে পদার্পন করলো। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ব্যঞ্জন - সমস্ত কিছুকে তুলে ধরে এপার বাংলার আর ওপার বাংলার একদল ছাত্রছাত্রী। তাদের নাচের তালে, প্রাণের বোলে নেচে ওঠে আমাদের মন। ক্যাম্পাসের কঁচি কাচাদের মন খুলে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের আবৃত্তি বা দলবেঁধে "এসে হে বৈশাখ!" গাওয়ার দিনগুলোকে একঝলক খুঁজে পাই।



এই প্রতিষ্ঠানের অন্যসব অনুষ্ঠান যেমন আমাদের মনের কাছের ঠিক তেমনই ঐক্যতান। তবু জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেমন একটি আলাদা আবেগ থাকে তেমনই ঐক্যতান আমার কাছে। তার এক এবং অন্যতম কারন বোধ হয় বাংলা ভাষা। যদিও বিশ্বায়নের যুগে বেশ কয়েক ভাষা আমাদের করায়ত্ত; তবুও মাতৃভাষায় বলা এবং লেখার সুযোগটুকু "রাজকীয় ভোজন" এর শেষ পাতে পাওয়া মিষ্টির মতো, যা না হলে খাওয়াটা সম্পূর্ণ হয় না।

ঐক্যতান ১৪৩১ এর জন্য রইলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ঐক্যতান বারে বারে বেজে উঠুক আমাদের মনে ও মননে। অঙ্কুর থেকে মহিরুহ হওয়ার পথ মসৃণ হোক। যা কিছু গ্লানি, সবটুকু পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাই আমরা এক নতুন বছরের দিকে ঐক্যতানের হাত ধরে।

দীপঙ্কর ভঞ্জন
অধ্যাপনা সম্পাদক (ঐক্যতান ১৪৩১)

EDITORIAL

As the vibrant hues of spring paint the canvas of nature, our hearts resonate with the melodies of Tagore and the aroma of freshly cooked sweets. It's that time of the year when with renewed fervor and enthusiasm, we welcome the Bengali New Year with open arms. In the midst of this festive ambiance, we proudly present to you the latest edition of "Bornomala," a tapestry woven with the threads of Bengali culture and creativity, as a part of our annual cultural extravaganza, Oikyotaan '24.



In the pages of "Bornomala," one finds not just literature and art but a reflection of the soul of Bengal. We are privileged to showcase the remarkable talents who have graced us with their poetry, stories, and artwork. Each piece is a testament to the richness of our literary heritage and the depth of creative ingenuity residing within us. To the poets whose verses dance like the gentle breeze through the fields of Shantiniketan while the storytellers who weave tales of love, loss, and redemption and the artists whose strokes breathe life into still canvases, we extend our heartfelt praises.

We also wish to express our deepest gratitude to the diligent members of the design and content teams, whose tireless efforts have brought "Bornomala" to life. Your dedication, creativity, and attention to detail have ensured that each page of this magazine is a visual and intellectual delight. May this edition inspire the readers and remind of the timeless beauty of Bengal.

Subho Noboborsho to all!

Anurag Debnath
4th Year, B.Tech
Editor in-Chief, "Bornomala"

সম্পাদকীয়

বসন্তের উদ্ভাসিত শিশুতার বেলা শেষে রুদ্র কাল
বোশেখ যখন অনল বর্ষন আর তীব্র বজ্রপাতে
উন্মত্ত; নববর্ষকে স্বাগত জানাতে ঐক্যতান'৩১
দাঁড়িয়ে বঙ্গ দুয়ারে।

সবাইকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের
শুভকামনা। নববর্ষের রঙিন আভা বর্ণিল করে
তুলুক আমাদের সকলের জীবন আল্পনা!

অতীতের ধারাবাহিকতায় ঐক্যতান'৩১ এর
বার্ষিক ত্রোড়পত্র "বর্ণমালা'৩১" এবার সাজানো
হয়েছে আমাদের এনআইটি পরিবারের



আলোকিত মনন গুলোর সাহিত্য সম্ভারে; রয়েছে শিল্পীর তুলির আঁচড়ে সৃষ্টি মানসপটের
প্রতিবিম্ব; মায়ের প্রতি সন্তানের অপত্য ভক্তির ব্যাঞ্জনময় প্রকাশ। বাংলা সাহিত্য ধারার
পাশাপাশি ভিন্ন ভাষী শ্রদ্ধাভাজন এবং বন্ধুবর দের লেখনীতে ফুটে উঠেছে তাঁদের সমৃদ্ধ
ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনচাের মায়াময় বৈচিত্র্য।

"গ্রীষ্মের খরতাপ থেকে শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ ভর দুপুরে

সমুদ্রতটের ক্ষিপ্ততা ছেয়ে নিস্তব্ধ মরু প্রান্তরে -

তব আজি এই নব প্রভার কুসুমিত কল্লোলে জীবনের জয়ধ্বনিই বাজুক সকল তরুণ
প্রাণের মর্মরে।"

নববর্ষের নব প্রভার এ শুভক্ষণে ঐক্যতান পরিবার "বর্ণমালা'৩১" আপনাদের হাতে তুলে
ধরতে পেরে আনন্দিত এবং উদ্বেলিত। ঐক্যতান পরিবারের হাত ধরে বাংলায় এ জয়যাত্রা
থাকুক অব্যাহত!

Jubair Protim
4th Year, B.Tech
Co-Editor, "Bornomala"

CONTENTS


কবিতা /Poetry _____ 1 - 20

1. ঐকতান - সুস্মিত গুপ্ত	2
2. মা - পর্ষন বন্দ্যোপাধ্যায়	3
3. সেই দিনগুলো - সৌভিক মন্ডল.....	4
4. ঈদ এলো রে... - অরণ্য দেব নাথ	5
5. শ্রেষ্ঠ আমি - বিজয়া বর্ধন	6
6. শাওনে অভিমান - রু..	7
7. অবাস্তব অনুভূতি - অরণ্য দেব নাথ	8
8. খুশি - জয়ন্তী নাথ	9
9. "তোমায় আমায়..." - -রু..	10
10. RAGGING - পরিব্রাজক.....	11
11. বন্ধু - মহ হাসানুজ্জামান.....	12
12. মা, আমার ভালবাসা - অনুরাগ দেবনাথ.....	13
13. আহির - ভৈরব - পরিব্রাজক	14
14. কে তুমি - নিখিলেশ বিশ্বাস	15
15. বউ - কথা - কও (পাখি) - পদ্মজা মজুমদার	16
16. কত মূল্যে বিশ্বাস হারিয়েছি - প্রান্ত দাস.....	17
17. রুটি - প্রান্ত দাস.....	18
18. To, my place - Namrata Barman	19
19. Widow - Md Hasanuzzaman	20

গল্প / STORIES _____ 21 - 50

1. The Yellow Affair - Anurag Debnath	23
2. দর্পণ দর্শন- -অয়ন তালুকদার	24
3. দার্জিলিং ডায়েরি: একভ্রমণ কথা - নিত্যানন্দ সরকার	26
4. এ আবার কেমন বাংলা! - তপস্যা ভট্টাচার্য	28
5. ভারত ভূমে বাংলার মনিষী - কন্টেন্ট টিম (লেখক)	30
6. চেলেখেলা - কন্টেন্ট টিম (লেখক)	34
7. বাঙালির জলখাবার - কন্টেন্ট টিম (লেখক)	37
8. গল্প - শিব শংকর	40
9. Durga Puja: The Queen of All Festivals - Durjoy Adhikary.....	44
10. Attractions of Jodhpur -Durjoy Adhikary.....	46

শিল্প / ART _____ 51-60



কবিতা

POETRY

ঐকতান

ঐ শোনো ঐ ঐকতান
বাংলামায়ের বীর সন্তান
জাতির গৌরব জাতির মান
হারাতে চাই না দিই সন্মান
ভুলি না কখনও রক্তে আমার
রবি সুভাষের উত্তরাধিকার।

আসুক তুফান আসুক ঝড়
যাব এগিয়ে মানব না হার
হাতে হাত ধরো বন্ধু আমার
উচ্ছে রাখো বিজয় নিশান ॥

-সুমিত গুপ্ত

মা

ভোরের দৃষ্ট আকাশ তুমি,
কিংবা মাঠের সবুজ দিগন্ত
ব্রহ্ম কমল মন যে তোমার
ভালোবাসতে জানো অনন্ত।

কর্মে তুমি তুলনাহীনা,
ফোটাও ফুল বাগ্‌ধারায়
কলম চলে আপন বলে
সামনে তোমার কে দাঁড়ায় ?

গুনতে গেলে গুণ যে তোমার
দশটি হাতের কড় ফুরোয়,
জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক ছটায়
মোদের ক্লান্ত চোখ জুড়োয়!

হাতে তোমার হরেক বাহার
দেখাও যাদু রান্নাতে
সেই হাতই আবার ডাকে কাছে
চোখ ভরা কান্নাতে!

সাফল্যে তুমি সাগরমাথার
শিখর ছাড়াও কাজ শেষে;
রূপে গুণে স্বয়ং স্বরস্বতী
রয়েছো মানবীর বেশে!

শিরায় শিরায় বইছে শিক্ষা
ধর্ম বলতে কর্ম যার,
সেই মহীয়সী নারীর ছোঁয়ায়
ধন্য হয় পরিবার!

প্রীতির বলে মন্ত্র দিয়ে
দেখিয়েছো পথ সফলতার।
ধন্য তোমার আত্মজ তাই
হয়েছে মোর জীবনোদ্ধার ।

-পর্যন বন্দ্যোপাধ্যায়

.. সেই দিনগুলো ..

চোখের পাতা এত নড়ছে এক দুই তিন
ও আজ তো বিদ্যালয়ে শেষ দিন!
এগারোটা সেতো ভোর
তখনও ঘুমের ঘোর,
দুই খানা অঙ্ক কষে
ঝিমাই বেঞ্চে বসে,
টিফিনের ডাক আসে দেড়টা কি দুটোতে
ছোটখাটো দুষ্টুমি দুই হাতের মুঠিতে!
দেখিয়ে পরীক্ষার ভয় কেটে গেলো কত দিন
মাথায় অনেক ঋণ!
পারবোনা সোধ দিতে
হয়তো বা ঘুম আর আসবে না মাঝ রাতে,
বিদ্যালয়ের পথ শেষ, আর হাটা হবে না
ক্লাসে বসে আড্ডা, আর মারা হবে না,
ফুরালো রঙিন দিন শেষে তবে বলে যায়!
যা দিয়েছি তোমাকে তা তোমারই দান
গঙ্গা জলে গঙ্গাস্নান করে এভাবেই হয়েছি পূর্ণবান
গ্রহণ করেছে যত
ঋণী করেছো আমায় ততো!
অন্তিমে আজ তবে যায়, যাবার বেলা মুখে নেই কোনো হাসি
ক্ষমা করবেন যাই বলতে নেই বলতে হয় আসি ।।

-সৌভিক মন্ডল

ঈদ এলো রে...

এক মাস সাধনার পর, উঠলো ঈদের চাঁদ;
কেউ ফোটায় পটকা-বাজি, কেউ করে চিৎকার।

আনন্দের আর নেই সীমা, ঈদ এলো রে;
বাড়ি বাড়ি নতুন সাজ, নতুন পোশাক পরে।

যাবো ঈদগাহে, পড়বো নামাজ ;
এরপরে কোলাকুলি, সবার সাথে আজ।

হাতে মেহেদী, মুখে হাসি, মনে খুশির বন্যা;
সবাই মিলে খাবো আজ, সেমাই, চিনি, কোরমা।

বাড়ি বাড়ি যাবো সবাই, করবো যে সাক্ষাৎ ;
মেতে উঠবো আনন্দে, যার সীমা নেই আজ।

ঈদ মানে হাসি, ঈদ মানে খুশি,
ঈদ মানে ভেদ ভুলে, সকলে মিলেমিশি।

ঈদের দিনে করবো মজা, হাসব, খেলবো, গাইবো;
বছর ঘুরে আসবে ঈদ, সবাই মনে রাখবো।।

-অরণ্য দেব নাথ

শ্রেষ্ঠ আমি

ধরিত্রী মা,আমায় ক্ষমা করবে
আমি তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানষু ।
শ্রেষ্ঠত্বের উপাধি ঘাড়ে চেপে আমি,
করছি জয় নগরাধি গ্রাম ।

আমার চাপে গরু মরে, বাছুর বলে ছাড়লে বাঁচি,
ডলফিন কয় ছেড়ে দে মোরে, সার্কাসে নয় আমি সমুদ্রে থাকি ।
পশু-পাখি সব ভয়ে কাতর, জঙ্গলে আসলো যে নতুন রাজা,
সে বাঘ ও নয়, সিংহ ও নয়, সে যে মানষু, যে দেয় সাজা ।

নদী বলে ভরিয়ে দেয় আমায় এরা
কেমিক্যাল, প্লাস্টিক জঞ্জালে,
মাছ কয় আমার ঘর বাড়ি গেল যে সব
আমি কোথায় যাই, কিসে বাঁচি ।
মানষু বলে কি করি বলো? আমি দিশেহারা !
চলছে যে এক ইঁদরু দৌড়
এতে আমার জেতার অনেক তাড়া ।
সে তাড়া আমায় ভুলিয়ে দিল কে আমি কিসে বাঁচি,
জল, মাটি, বায়ু সব ভুলে আমি কংক্রিটের পিছে ছুটি ॥

-বিজয়া বর্ধন

শাওনে অভিমান

শাওন রাতের কোন আলোক আঁধারে
চমক লাগে যখন মেঘ মল্লারে,
বৃন্দার মনেও যে তড়িৎ জাগে-
সে কি আজও সখা তোমার প্রাণ এ লাগে?

অবিরাম সেই ঘন ঘোর বর্ষণ
সজল ধারাপাত ও যে মানেনা বারণ
প্রকৃতি ও আজ বিরহ জ্বালায়
সাধের কুঞ্জবন ভেসে যায়, হয়...

মেঘবালিকারা তাই চঞ্চল চিত্তে
করেছে বার্তা প্রেরণ চপল নৃত্যে,
রাই শুধু বসে প্রহর গোনে
সখা বুঝি এসে দাঁড়াল এ ক্ষণে...

সখার ও মন আজ বড়ই অস্থির
জানে সে প্রেমে ধরেছে চিড়,
নিজ হৃদয় আজ নয়তো আপন
বৃন্দার ই কাছে পরে আছে সে মন

বাধা শুধু মাঝে মান-অভিমান
তার ই দোষে আজ বেসুরো গান,
বিচলিত মনেও সেই অনুরাগ
আসবে কবে আবার প্রেমের সে ফাগ...

ঘুচে যাবে সব দ্বন্দ্ব যেদিন
রক্তিম আভা রাঙাবে সেদিন
বৃন্দার ও অধরে ফুটবে হাসি
বাজবে আবার, সখার প্রেমের বাঁশি... ।।

-রত..

অবাস্তব অনুভূতি

দেখেছি যেদিন তাকে সবুজে ভরা মাঠে
নীল আকাশের নিচে রোদে ভেজা
ঠিক সেই দিনের পর থেকে চারিদিকে আসে পাশে
জানিনা কেন পাই তার দেখা ।

তার মুখ ভরা হাসি যেন নানা রঙে রঙানো
যাকে দেখে হয় হিংসুটে ইন্দ্রধনুষ
তার গালের টোল কেন গভীর এমন যেন
মৃদু বাতাসে সৃষ্ট জলের গর্ত।

দিনের কাজের শেষে বিকেলে চায়ের সাথে
যদি পাই তার দুচোখের দেখা
সারাদিনের পরিশ্রম ফুরিয়ে যায় যেমন
রঙিন লাগে সাদা কালো এই বেলা।

তার আঁখির ভিতরে যেন বহিয়া আছে কেন
রাতের ওই গভীর স্থির নদী
কাবেরী যমুনা যেমন তারও ঠিক তেমন
শীতল হাওয়ায় ভরা দৃষ্টি।

তার লম্বা কালো চুল যখন বাঁধতে হয় ভুল
ওরে এসে ঢেকে দেয় তার আঁখি
তার চঞ্চলতায় ভরা হাসি ঠাট্টা ও কৌতুক
যেন এক আনন্দ উৎসবের অনুভূতি ।।

-প্রাঞ্জল চক্রবর্তী

খুশি

সখি “খুশি খুশি” বলে ওরা
খুঁজে বেড়ায় দেশ দেশ দেশান্তরে
কি রে সখি! ওরা কি জানে না ?
খুঁজতে জানলে পাওয়া যায়
ছোট্ট জিনিসের মধ্যেও খুশি -

স্নান করতে গিয়ে খালি বাথরুম পাওয়ার খুশি,
মেসে হঠাৎ ভালো খাওয়ার পাওয়ার খুশি,
আটটার ক্লাসের এলার্ম বন্ধ করে যখন
আতঙ্কে উঠে দেখো ক্লাস ক্যান্সেল হয়ে গেছে তার খুশিই হোক
বা কলেজ ফেস্টে
মধ্যরাত্রে বন্ধুকে হারানোর পরও খুঁজে পাওয়ার খুশি -
সে খুশি যে অনন্য !

তাইতো বলি সখি, তুইও খুঁজে দেখ,
খুশি পেয়ে যাবি নিজেরই মধ্যে।

-জয়ন্তী নাথ

‘তোমায় আমায়...’

মরসুমের নীরব দূরত্ব শেষে
মনকেমনদের আলো থেকে আলোকবর্ষে
নির্বাসিত দিনগুলোর
সমাপ্তির হাতছানি.....
তোমায় আমায় হবে আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ.....
নীল নির্জনে কুয়াশার চাদরে
থমকে যাওয়া ব্যস্ত সময়ে
ভেজা ভেজা দুটো ঠোঁটের
আদর মাখা স্পর্শ...
তুমি, আমি আর ক্ষয়ে যাওয়া রাত.....
ঘুম জাগা ভোরের মায়ায়
শিশিরে লেখা টুকরো কথায়
অন্তহীন সেই গভীর চাহিদার
প্রথম জেগে ওঠা...
তোমার আমার সেই আধফালি চাঁদ.....
আবার কবে ফিরে আসবে?
প্রেমকে ভালোবেসে কাছে ডাকবে?
আলিঙ্গনের ভিড়ে সমস্ত প্রতীক্ষার দীর্ঘশ্বাস, নিঃশেষ হবে...?

-রু..

RAGGING

ফুলের মত ছেলের দল ঐ ভার্শিটিতে বন্দি,
অনেক দাদা ওদের নিয়ে আঁটছে মারণ ফন্দি।

স্বপ্নগুলো ক্যাম্পাসে যায় শত স্বপ্ন বহন করে,
কত স্বপ্নই বাড়ে পড়ে দিন দুই-তিন পরে!

'Intro' দিয়ে শুরু হয় 'শিক্ষামূলক' journey,
সূচনাতেই জ্বলতে থাকে সমাপ্তির বহি।

অন্তর্বাস থাকল কিনা care করেনা দাদা,
নির্মম শত অত্যাচার ওদের 'syllabus'-এই বাঁধা!

"Ragging টা তো হতেই হবে, ভাইগুলো যে 'শিশু',
শুরুতেই ওদের বোঝাতে হবে, 'আমরা' ধেড়ে পশু।"

"ক্ষমতা 'মোদের' দেখাই যত চার দেওয়ালের মাঝে,"
অমূল্য কত ভবিষ্যত পথ হাতড়ে বেড়ায় সাঁঝে!

অসহায় সব মাতা-পিতার চোখে দঙ্ক শোকের ভাষা,
ওরে পাষণ, ওরে দানব, তোদের একি নগ্ন নেশা?

পোড়া, কাটা হৃদয় নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীরগুলো,
বহর আঠারোর অরোধ বালক কত যন্ত্রনাটাই না পেল!

শাস্তি পাক দোষীর দল, শাস্তি পাক হীন,
শিক্ষালয়ে ফিরে আসুক নোংরা Ragging মুক্ত দিন।

- অরিত্র সাহা

বন্ধু

রাত্রে গভীর নিদ্রায়,
ঘুমিয়ে আছে সবাই।
বন্ধু নাহি কাছে বলে,
চক্ষু থেকে ঘুম গেছে চলে।
একা বসে ঘরের কোণে,
ভাবিতেছি আমি মনে মনে।
বন্ধু, শুধু যে তোমারই কথা,
তুমি কবে ফিরিবে সখা?
আমার বন্ধু তুমি এ-জনমে,
এখনো রহিয়াছো আমার প্রাণে।
তোমার মত বন্ধু কোথায়,
বলো, কে কেমনে খুঁজে পায়?
গাছ-পালা যত পশু-পক্ষী,
সবাই রহিয়াছে এ-বন্ধুত্বের সাক্ষী।

-মহ হাসানুজ্জামান

মা, আমার ভালবাসা

সেদিন বহু বছর আগে
তোমার মাঝ রাতের কান্দায়
ইশারা পেলে ভগবানের জে আমি আসছি

সে আজ ও আমি ভাবী
যে তুমি আমার মা নাহলে
আমি কি এই প্রকান্ড দুনিয়া তে বাঁচি

তোমার দেওয়া খস্তির পিটন
বা তোমার কোলে শুয়ে আমার মনের কান্দোন
সব হি আমার কাছে এক

আজ ও আমি ভয় পাই
এই দুনিয়ার অজান বহুরূপী শত্রু কে
কিন্তু তুমি পাশে থাকলে যেন
সর্ব শান্তির অনুভূতি হয়ে

মা তুমি যেও না
আমাকে ছেড়ে যেও না
আজ ও দিশাহারা রাস্তা দিয়ে গেলে
তুমার আলো ফিরিয়ে আনে আমায়

মা তুমি কোথায়
আমায় ছেড়ে যেও না
তুমি আমার ভালোবাসা তুমি হি থাকবে সদায়।

-অনুরাগ দেবনাথ

আহির – ভৈরব

যেমন করে রাত কেটে যায়
দিনের আলো আসে, তেমন করেই একলা জীবন
আমায় ভালোবাসে ।
রোজনামচার রোদ দুপুরে
খামখেয়ালি ছায়া,
আরেকটু পথ গড়িয়ে পায়
বিষন্নতার মায়া ।
চিলেকোঠার বিকেলবেলা
গল্পে মেলে ঠাঁই,
সেইখানেতে আমরা দুজন
সন্ধ্যে যে নামাই।
কথার উপর জমেছে কথা
মেঘের উপর চাঁদ,
ছাদের উপর বিছানা পাতা
বাইরে মরণফাঁদ।
তবুও, দেখব স্বপ্ন, শুনব
পাখির কলরব,
নতুন ভোরে উঠবে বেজে
মোদের আহির ভৈরব।
আহির-ভৈরব ॥

- অরিত্র সাহা

কে তুমি

কে তুমি?

কে তুমি হে সখা;

এসেছ কি আমারই তরে?

ভেঙে মোর ঘুম, ডেকো না আমায়-

ও পথে যে বড় ভয় করে।

কে তুমি হে সজনী?

তোমার ওই স্নিগ্ধ আঁখিপাতে

কেন খুঁজে পাচ্ছি কোপাইয়ের তীর;

কেন তোমার ওই মুক্ত কেশরাশী

লাগছে মোর যেন সজল বাদল নিবির;

কেন তোমার ওই পায়ের নূপুর

শোনাল মোরে ভোরের পাখির কলতান;

কেন তোমার ওই গভীর দু'চোখ

করে চলেছে মোরে হেন আহ্বান?

জানিনা, আমি জানিনা!

এ কী মোহ?!

মুখর আজি মোর নীরব অন্তরখানি

শুধায় মোরে কেন সে আজ মধুর অমৃতবাণী ?

বলে দাও, তুমি বলে দাও-

কি হেলায়, কি দ্বিধায় গেঁথেছ তুমি আমায় ?!।।

- নিখিলেশ বিশ্বাস

বউ – কথা – কও (পাখি)

কোন্ অচিন দেশের পাখি হয়ে
এলে চলে, এই ছোট্ট গাঁয়ে,
নতুন বরসের শুভ যাত্রা নিয়ে আমাদের তরে
আশ্রমুকুলের সুবাসে প্রায় মাতোয়ারা
গান গেয়ে বেড়াও হয়ে আত্মহারা ।
বসন্তের ভোরের হাওয়ায় শুরু কর গান
রূপালি - রোদে এর হয় অবসান ।
আলো - আঁধারিতে তোমার "বউ কথা কও" ডাকে
প্রানমন যেন উতলা হয়ে ওঠে ।
কোন অভীত থেকে তোমার এ-যাত্রা
হয়তো জানে না কেও এর বার্তা
আম- কাঁঠালের পাকা গন্ধ পেয়ে
চলে যাও ফিরে আপনার নীড়ে
জানি না কোন অদৃশ্য শক্তির টানে
আবার ফিরে এস আমাদের পানে ?

-পদ্মজা মজুমদার

কত মূল্যে বিশ্বাস হারিয়েছি

কত মূল্যে বিশ্বাস হারিয়েছি
আমি জানি।

উঠপাখির মতো ডানায় পাথর বেঁধে
কালো পর্দায় আড়ালে উড়তে চেয়েছি।
জঙ্গি হয়ে যুদ্ধে নেমেছি
প্রান্তরে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের ঘসায়
মুছতে চাওয়া শাণিত ভাবনার বিরুদ্ধে,
গভীর রাতের উন্মত্ত নখের আছড়ে
বুকে সহস্র ক্ষতের চিত্র এঁকেছি,
মহাধমনী ধরে রক্ত চোষেছি।
নিঃস্বতার সমুদ্রে সাঁতরে বেড়িয়েছি,
একাকীত্বের দাবানলে দগ্ধ হয়ে
বিশ্বাসকে জীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি।
ভার বইতে পাতালের রসে মাতাল হয়েছি,
হতাশায় বাঁধানো রুম্ম জীর্ণ বুকে
গেথেছি বুলে পরা পরাজয়ের পতাকা।

-প্রান্ত দাস

রুটি

যেন জলসানো রুটি;
দাঁতের জোড় অনাহারে গিলেছে।
চাঁদের বুড়ি সত্যিই বুড়ি
চড়কার সুতো দালানচূড়ায়
চোখে মুখে মরণ টুটি; কাপছে শীতে।
মাটিতে রস খোঁজে আর বিষ রসে,
পূর্ণিমা রাতে হতদরিদ্র মরছে ভাতে।
এককণা চাঁদ আকাশে সাঁতার কাটে
আর 'অভুক্ত চাঁদ' কেঁদে আঁচল চিবোয়।
খোলা আকাশের নিচে নরম বাতাসে
স্তব্ধ রাস্তায় ছোট্ট পরী আনন্দ বিলায়,
মা আকাশে মেঘ গুনে আর গতি মাপে
চোখের তারায় বিদ্যুৎ চমকায়।
আলো মেঘের খামচায় কালো হয়েছে,
ল্যাম্পপোস্টে সূর্য উঠেছে লাল আলোয়।

-প্রান্ত দাস

To, my place

Today, I decided to look out,
Out at my environment of humans.
I saw a tired mother,
Doing all the work where no one else would bother
saw a bachelorette, fantasizing her marriage
but it's the passing days which we cannot till
Gone two steps more,
Saw a girl who was called a whore
for she dressed for herself & managed her chores.
Went a bit more,
And got a view, of a completely closed door.
Behind which a way studied,
To become the man of his dreams.
Managed a few more steps &
Saw some hectic image
Everything may be common but violence should be not,
Leave the man who does not value you a lot.
Going on,
I saw a child, with whom thousands lived their lives.
A grandmaa rested her eyes, a maa survives the day
& a paa sees his self.
I too see in it, my old days.
Returning to my home, with sights in my memories
& days, those old days left behind,
I saw a village which tries to be the best
win's a special place in my heart's nest
& is my very own.

-Namrata Barman

Widow

One day I watched outside
through the open window.
A woman from my neighbour
was wailing who became a widow

She was sitting with a grief
on the path's milestone.
Because her husband left this world
leaving her quiet alone.

I understood her feelings and
became sad with unhappy tears.
She was crying aloud for
her husband that I heard.

I went outside from my room
and tried to console her.
And told forget all these
and think about what would occur.

I tried to comprehend her
for many of the times.
Then she understood and
pacify herself after sometimes.

I then asked about her home
and told her to go.
She went and I think
about the life of widow...

-Md Hasanuzzaman

গল্প

STORIES



প্রিয়া দাস

Shoofy

The Yellow Affair

Once my friend told me, “Your dreams get fulfilled when you expect them the least.” Indeed, my long dreamt ‘Yellow Affair,’ a brief one though, embraced me with warmth, finally!

Over the past five months, I was fortunate enough to make my presence in Bengal’s largest international airport precisely four times, albeit for transit purposes only. Thanks to my institute located far away from my cozy little home in the Western Coasts. And guess what, every single time it gives you a sensation of being surrounded by vibing culture and a vibrant home away from home.

You suddenly feel your ears faintly humming to melodious Rabindra Sangeet and your delicate hands lingering in the flowing water of the Holy Ganges. You find your lips smacking a piece of Jumbo Elish wrapped in aromatic yellow mustard sauce, and out of somewhere you remember her. She has been my unfulfilled wish since my last visit about half a decade ago. She’s rare as a diamond these days and hence has my highest respect. What more? She’s always draped in yellow.

My love of Bengal which can almost always be found near the airport is none other than the famed ‘Kolkata Yellow Taxi.’ Ah! The name is enough to melt me.

The Hindustan Motors Ambassador painted in Bright yellow with a Prussian blue strip running across it has become an icon of the heritage city it serves. After a rich history of two decades carrying filmmakers and commoners alike, they are on the verge of decline. What’s ironic these days are the words “No refusal” printed boldly on the passenger doors on each side. Yet believe it or not, everyone loves them by heart.

The car in itself is a chubby one owing to its very rounded corners and equally circular prominent eyeballs. The front grill forms its moustache giving it a royal air. If you’re born in the period of 1980-2000, most of your childhood must have been spent traversing it, in and out of any chosen city in our country.

I remember once watching a BBC feature ‘World’s best taxi’, a race in which among 10 renowned global taxis, the Ambassador justified itself as the king. It is, and it will be forever...

As far as my dream is concerned, I got to ride one this time on a warm Juny day from a metro station to a local shopping complex in the city centre. I was accompanied by Ma and Bhai in the backseats. The essence of the forever stuck door handle, two-spoke black steering wheel and the aimlessly rotating speedometer merely existing and the weirdly shaped gear lever sent shivers down my spine. I observed every inch of the centuries-old streets and alleys of the capital city as we sped up to our destination, making it my ride of the year in any vehicle.

God is so kind and surprising at times, he teaches us to wait for our love and thereby value them until the right time comes. At the end of the two-day heartwarming tour of Kolkata covering some prominent places and authentic cuisine, I’d still rate my silent love story with ‘the slowly disappearing-ever charming-yellow taxis’ above all the affairs that took place in the history of the world.

Hoping to be with her soon once again, maybe right in the driver seat someday, I take off today. Cheers!

-Anurag Debnath

দর্পণ দর্শন

"১৯৭১ সন, পুরো দেশে যেনো মহামারীর আতঙ্ক, মান্না তখন কোলের শিশু, মালিনির অধভাশায় কথা বলে শবে শিখেছে। হটাৎ যেনো ধু ধু করে মাঠ থেকে ছুটে আসল একদল রাখল। বেরিয়ে দেখলাম ওরা তো আমাদের বাড়ির সুবল আর তার ছেলেরা। কিছু জিজ্ঞেস করার আগে সুবল বললো "বাবু তাড়াতাড়ি ঘরে ধুইকা পরেন, পাসের গেরামের রাজাকার আইসে।" তাড়াতাড়ি আমি মান্না কে তার মার কুলে দিয়ে মালিনী কে আমি নিজের কুলো তুলে নিলাম। বাকিশবাইকে ঘরের ভিতরে আসতে বললাম, বাড়ির সব ছেলেদেরকে সব দরজা বন্ধকরে তার পিছনে পাহারা দিতে বসিয়ে দিলাম। টানা ৩৮ ঘণ্টা এইভাবে কাটানোর পর বাইরে থেকে কেউ যেনো ডাকলো। আমি উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "কে?"। বাইরে থেকে পাল্টা উত্তর এলো "বাবু আমি পাশের গ্রামের সুধীর, আমার পরিবারটারে শেষ কইরা দিল", তার কণ্ঠের চাপা কান্না আর চোখের আড়ালে জল, আমি যেনো দরজার অন্য দিক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। দরজা খুলে দিলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে অনায়াসে কাঁদতে থাকলো সুধীর। খানিক পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম "

পরিবারের বাকিরা কই? কেউ নাই সাথে?"। আশার ব্যর্থ জবাবের দৃষ্টিতেই সব বুঝিয়ে দিল সে। গতকাল রাতে যে রাজাকাররা এসছিল তারা সুধীর এর মতন অনেক জনের ই পরিবার আর জীবন তছনছ করে গেছে। সুধীর কে শান্তনা দেওয়া ছাড়া আমার কাছে আর কিছু ছিল না। মনে মনে ঠিক করলাম কাল ই ক্যাম্প এর দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বাংলাদেশ আর আমার আগের বাংলাদেশ না।"

"দিন চারেক পর আমরা সদলবলে পৌছলাম ক্যাম্প। শুনতে পেলাম ইন্ডিয়ার সরকার নাকি মুক্তি যোদ্ধা দের সব প্রকারে সাহায্য করবেন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ক্যাম্পে প্রথম দিন ঠিক ই কাটলো। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে এ আবার আতঙ্কের হাতছানি। ক্যাম্পের উত্তর দিকে অচেনা জন সমাগম দেখা দিয়েছে। ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু এইসময়ে ঝুঁকি তো কোনো কিছুতেই নেওয়া যাবে না। ক্যাম্প এর ইনচার্জ আমার সহপাঠী, তৎক্ষণাৎ খবর দিলাম তাকে। সে তার কয়েকজন গুপ্তচরদের তখনই কাজে লাগিয়ে দিল। ঘণ্টা খানিক পর গুপ্তচর এর দল এসে

খবর দিল পাকিস্তানি কয়েকটা জওয়ান নাকি উত্তর দিকে তাদের ক্যাম্প লাগানোর ব্যবস্থা করছে। বুঝতে পারলাম ক্যাম্পে ও নিরাপত্তার অভাব। কিন্তু এখন তো ভারতে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা উত্তর দিক তো পাকিস্তানের জওয়ান দেব আড্ডা। বন্ধুর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, রাস্তা সাফ করতে হবে। আমাদের বুনেদি বন্দুকটা নিয়ে এসেছিলাম আমার সাথে। আমি, আমার বন্ধু এবং ক্যাম্পের কয়েকজন যুবক, কার্যরত জওয়ান দেব নিয়ে ই উত্তর দিকে ছুটে গেলাম। তারপর যা

হল আর থাক অন্য কোনো দিন বলা যাবে" - এই বলে দাদু গল্প শেষ করতে না করতে দেখলাম দাদুর চৌখের কোনো কান্নার জলের হাতছানি, কিছু একটা যেনো বলতে চাইলেও বলতে পারছেন না। দাদুর কুলে গিয়ে বসলাম আমি। "আজো ভাবি ঠাকুর যদি একবার এর জন্য আমাকে মালিনী আর মালিনীর মার একটু হৃদিস দিতেন।" বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দাদুভাই।

-অয়ন তালুকদার



শিরশা সিন্ধা

দার্জিলিং ডায়েরি: একদ্রমণ কথা

ইতিবৃত্তান্ত। দার্জিলিং পৌঁছে সোজা চলে গেলাম-পদ্ধজা নাইডু হিমালয়ান ২০০, আর হিমালয়ান mountaineering ইনস্টিটিউট- এ। সেখানে কি কি না দেখলাম? বাঘ,ভাল্লুক,সাপ,শেয়াল। সেখানে,সংগ্রহশালা তে মন ছুঁয়ে যাওয়া অনেক ঐতিহাসিক জিনিস দেখলাম। আর দেখলাম,হিমালয়ান মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউট ট্রেনিং প্রাপ্ত এভারেস্ট জয় এর ২০ মিনিট এর একটি তথ্যচিত্র। সারাটা দিন কেটে গেলো সেখানেই। তারপর খাওয়া দাওয়া করে,চলে গেলাম চক বাজার, মল রোড-সহ,আরও অনেক জায়গায়! তারপর আমি এবং আমার বন্ধু . পরিবারের সকলের জন্যে উপহার নিলাম। তারপর সেখান থেকে শেয়ার ট্যাক্সি করে চলে গেলাম,ঘুম শহরে। হ্যাঁ,এই ঘুমেই আছে,উচ্চতম রেলওয়ে স্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই "ঘুম" শহরের উচ্চতা প্রায় ৭৪৭০ ফিট। ঘুম এ ছিলাম,"নন্দিতা হোম স্টে"তে। সেখানকার, কর্ণধার ভদ্রলোক ছিলেন খুবই ভালো মনের একজন মানুষ।

রুম এ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক,গরম জল নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমাদের খবরা-খবর নিলেন। বছরের মার্চ মাস থেকেই ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে হানা দেয়,মারণ ভাইরাস করোনা (COVID-19)। মার্চের ২৩ তারিখ হতে শুরু হয় লকডাউন,যা ইতিহাসের পাতায় যা আমি কখনো দেখিনি। লকডাউন,আমার পাখির মতো উড়ন্ত মনে প্রভাব ফেলেছিল ব্যাপক। নিজেকে এক পাগল বন্দি মনে হচ্ছিল। খোলা আকাশে আমার মনটা একটু উড়তে চাইছিল। নিজের বন্দি মনকে শান্তি দিতে, আর খোলা আকাশে একটু ডানা মেলতে, ২২ তারিখ সকাল ৪.০৮ এ বেরিয়ে পড়লাম,দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে । সঙ্গী বলতে একমাত্র শুভজিৎ।সকাল ৫ টার বহরমপুর এর বাসে উঠে চলে গেলাম,শিলিগুড়ি জংশন এ। সেখান থেকে ৮ টা এর বাসে করে পৌঁছে গেলাম শৈলশহর দার্জিলিং- এ। দার্জিলিং এর মাটিতে পা দিতেই অনুভব করলাম,কেন? দার্জিলিং- কে "QUEEN OF HILLS" বলে। বাস ছাড়ার প্রাকমুহুর্তে,বাসচালকের সাথে অনেক আড্ডা হলো,কথা হলো।

তিনি আমাকে ফাটাপুকুর এর রক্তাঙ্ক ও দুঃখজনক বাস অ্যাকসিডেন্ট এর কথা জানালেন আর বললেন পাহাড়ের আমাদের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে,কাল সকালে আমরা হেঁটে হেঁটে টাইগার হিল" যাবো। ভদ্রলোক আমাদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বললেন।শুয়ে পড়লাম আমরা।

সকালে,কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু, ভদ্রলোক এসে,আমদের ডাক দিয়ে তুলে দিলেন আর আমাদের উৎসাহিত করলেন,টাইগার হিল এর উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার জন্যে।এ কটু পরেই তিনি আমাদের দুজনের হাতে এনে দিলেন দার্জিলিং চা।চা এর পেয়ালা তে চুমুক দেওয়া মাত্রই এক অপূর্ব স্বাদ ও সুগন্ধ অনুভূত হলো। সত্যি এটা সত্যি,"দার্জিলিং চা এর স্বাদ ও সুগন্ধ - পৃথিবী বিখ্যাত"। আমরা তৎক্ষণাৎ (ভোর ৫ টা তে) বেরিয়ে পড়লাম,আমাদের যাত্রা পথের উদ্দেশ্যে।খুব ঠাণ্ডা ছিল তখন। ঘুম শহরের উষ্ণতা তখন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।ঠান্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছিল,আর শরীরের রক্ত গুলোও যেনো আত্ননাদ করে উঠছিল। হেঁটে হেঁটে ঘুম শহর থেকে ৫.৫ কিমি উঁচুতে অবস্থিত টাইগার হিল উঠলাম; কখনও দৌড়ে,কখনও হামাগুড়ি দিয়ে,কখনও বন্ধু অর্থাৎ সহযাত্রীর ধাক্কাতে। সূর্যমামা ২০ মিনিট দেরিতে উঠেছিল,তাই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, টাইগার হিলের সূর্যোদয়। এই জন্যে সেই কর্ণধার ভদ্রলোক আর সূর্য মামা কে তাই অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই মনোরম টাইগার হিলে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। সেখান থেকে দেখা চারদিক-কার অপূর্ব দৃশ্য, এখনও আমার মনে দাগ কাটছে।

তারপর ৯ টা নাগাদ অপূর্ব পাহাড়ি রাস্তা ধরে বেতের বন থেকে লাঠি নিয়ে, আসতে আসতে চারদিকের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নেমে আসলাম,ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষন। একটু পরেই বাস উকি দিতেই আমরা ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম সেই বাস এ।তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে কমলালেবু খাওয়ার ঘটনা, আমার আজীবন মনে থাকবে। তারপর,বাস ধরে পাহাড়ী শহর ঘুম তথা দার্জিলিং থেকে নেমে আসলাম সমতল শহর শিলিগুড়ি তো।শিলিগুড়ি পৌঁছুলাম ২.২৪ - এ। সেখানে নেমে,১০০ মিটার দৌড়ে ধরলাম,২.২৫ এর শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি NBSTC বাস টিকে। এক মিনিট দেরিতে ছাড়ায় ধরতে পেরেছিলাম সেটিকে। তারপর,বাড়ির পথের বাকি পথটা কাটিয়ে দিলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। জন্মভূমি তথা জন্মশহর এ পৌঁছতেই মনটা কেমন জানি করে উঠলাম। ক্লান্ত শরীরে নেমে পড়লাম সর্দারপাড়া মোড়ে। তারপরের বাকি পথটা হাঁটাপথ। অবশেষে বাড়ি পৌঁছুলাম।সত্যি কথা বলতে, আরও একদিন থাকতে ইচ্ছে করছিল শৈলসহর দার্জিলিঙে। যাইহোক মন থেকে আমি এক টাই কথা বলতে চাই -"হ্যাঁ,আমি পাহাড় প্রেমী" আর আপনি??

- নিত্যানন্দ সরকার

এ আবার কেমন বাংলা !

এতদিন তো অনেক পরীক্ষাই দিলাম এবং প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই মনে হয় যে সব উত্তর শুদ্ধ লিখে এসেছি। কিন্তু পরীক্ষার খাতা দেখার পর সব আশাই নিরাশায় পরিণত হয়। ঠিক সেরকমই এই কয়েকদিন আগে পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়ে আমার সাথে ঘটে একটি মজাদার ঘটনা। স্যার যখন উত্তরপত্র দেখালেন সেটা দেখে আমার মনে হল সবই তো শুদ্ধ লিখেছি তবে তাতে এত কম নম্বর কেন? স্যারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “স্যার, এই উত্তরটা তো আমার শুদ্ধই হয়েছে, তাতে নম্বর কেন কাটলেন ?” । তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “শুদ্ধ হয়েছে ? মানে? এ আবার কেমন বাংলা !”। পাশে থাকা আমার পশ্চিমবঙ্গের বান্ধবী তানিয়াকে দেখিয়ে বললেন, “ওকে জিজ্ঞেস করো, ও কি এরকম বাংলা বলে?”। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম আমি তো সবই শুদ্ধ বললাম এতে আবার ভুল কোথায় ? পাশ থেকে ও বলে উঠল, “আরেহ, ওটা 'শুদ্ধ' নয়, ওটা — 'ঠিক' ”। আমি খতমতো খেয়ে গেলাম। বাংলা আবার কত রকম হয়?

তারপর বুঝতে পারলাম আমরা যেমন বলে থাকি উত্তরটা “শুদ্ধ” হয়েছে ওরা এর বদলে বলে উত্তরটি “ঠিক” হয়েছে। এই কনফিউশনের ঘটনাটা যে স্যারের সাথে শুধু আমারই হয়েছে তা নয়, আমার বান্ধবী রুমা, যে আমারই মত কথা বলে, সেও একই রকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। একদিন সে স্যারকে ক্লাসে বলল বোর্ডের লেখাগুলো না ‘মেটাতে’ । স্যার তো যথারীতি বোঝেননি এবং দু-তিনবার বলার পরও সে যখন দেখল, যে স্যার এভাবে বুঝবেন না, তখন সে হাতের অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোনমতে স্যারকে কথাটি বোঝাতে পারল। স্যার হেসে বললেন, “আচ্ছা, তোমরা লেখাটা 'মুছতে' বারণ করছো”। স্যারের কথা আমরা ঠিকই বুঝতে পারলাম তবে এও বুঝতে পারলাম যে একই অর্থের দুটি আলাদা শব্দ যখন ব্যবহার করা হয়েছে, তখন স্যারের কাছে সেটি একটা নিতান্তই অজানা ভাষা বলে মনে হয়েছে যা তিনি বুঝতে পারেননি।

আজকাল দেখছি মেসের ফিক্স করা মেনু থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে অনেক রকম পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কখনো কখনো সোমবার ও বুধবারের মেনু অদল-বদল হচ্ছে,

কখনোও বা দেখছি নানা রকমের নতুন খাবার খেতে দিচ্ছে। এত রকম খাবারের মধ্যে সবার তো সবকিছু পছন্দের নয়, তাই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা চল আছে যে,যে ই আগে মেসে পৌঁছবে, আমরা তাকে ফোন করে জেনে নিই আদৌ সেদিনের খাবার আমাদের পছন্দের কিনা। ঠিকঠাক লাগলে ক্লাস থেকে এতটা দূর হেঁটে আমরা খেতে চলে যাই নয়তো সেদিনকার মত লাঞ্চটা ছেড়েই দিই। এরকমই আমি একদিন সবার আগে মেসে পৌঁছে দেখলাম কাঁঠালের তরকারি দিয়েছে, তা আবার আমার খুব প্রিয়। যথারীতি ফোন করে বন্ধুদের সেটা জানালাম। তানিয়া শুনে বলল, “কাঁঠালের আবার তরকারিও হয় নাকি ? কেমন লাগবে খেতে? না না আমি ওসব খাবনা।” তবুও তরকারিটা ভালো লাগলো বলে ওর জন্য অল্প রেখে দিলাম। ক্লাস থেকে ফেরার পর তানিয়া দেখে বলল, “আরেহ!এটা তো এঁচোড়ের তরকারি কাঁঠাল তো আমরা পাকা ফলটাকে বলি, আগে যদি বলতিস তাহলে তো খেয়েই যেতাম।”

ঠিক এরকমই আরো অনেক শব্দ আছে, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি।যেমন আমরা বলি 'করলা ভাজা' যাকে তানিয়ারা বলে 'উচ্ছে ভাজা', আমরা বলি 'বাতাস দিচ্ছে', ওরা বলে 'হাওয়া দিচ্ছে'। কথাগুলির অর্থ যদিও সমান তবে বলার ধরণটা আলাদা।পূর্ববঙ্গ,পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তফাৎ হলেও মূলতঃ সবই এক বাংলা ভাষা । দু একটা শব্দ যার অর্থ একই, কিন্তু শব্দগুলো শুনতে অনেক ভিন্ন লাগে সেগুলো হঠাৎ করে শুনলে আমাদের কাছে মনে হয় 'এক অজানা বাংলা'।তবে বেশিরভাগ সময়ই আমরা একে অপরের কথা অনায়াসে বুঝতে পারি।সবকিছুই মিলেমিশে একাকার এবং আমাদের বন্ধুত্বও অটুট, সম্পর্কও সুদৃঢ়।

-তপস্যা ভট্টাচার্য

ভারত ভূমে বাংলার মনিষী

রত্নগর্ভা ভারতমাতা অসংখ্য বাঙালি জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী জ্ঞান তাপস শিল্পী এবং বীর দেশনায়ক সন্তানের জন্মদানে ধন্য। তাঁদের স্মরণ করে ধন্য হবেন জগতবাসী। কোনভাবেই যাতে ভুলে না যাই তাঁদের অবদান তাই প্রয়োজন রয়েছে জানার এবং জানানোর। এই মহাপ্রাণ মনিষীদের শত কোটি প্রণাম।

“বাংলার ইতিহাস চাই,

না হইলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না”

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর এই কথা ভাবলে বিস্ময়ের শেষ থাকে নাহ। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রসরচনা—যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি এমন একটি উচ্চ-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যা আজও অনুকরণযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৭-এ জুন ১৮৩৮ ইংরেজি উত্তর চব্বিশ পরগনার কানখলপাড়া গ্রামে নৈহাটির একটি গোঁড়া বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। প্রথম জীবনে তিনি কবিতাও লিখতেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’। এটিকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে একে একে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি। বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ শিল্পরূপটি গড়ে ওঠে। কালানুক্রমিকভাবে তাঁর উপন্যাসগুলি হল ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মৃণালিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দিরা’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাধারাণী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘দেবদাস’।

প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য অবদান বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। তাত্ত্বিক আলোচনা, রসরচনা, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল ‘লোকরহস্য’, ‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ প্রভৃতি। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সংগীত “বন্দে মাতরম” গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র; এই সংগীত ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশ প্রেমিক সংগ্রামীদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লবের কথা ভাবলেই মাথায় আসে "বিদ্রোহী কবি" কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) - বাংলা সাহিত্যে যার কবিতায় ঝঙ্কার দিয়েছে বিদ্রোহের সুর, জেগেছে বিপ্লবের আগুন। তিনি একজন বিখ্যাত বাঙালি কবি, সঙ্গীতকার এবং দার্শনিক। আবেগপূর্ণ ভাষা, সাহসী চিত্রকল্প এবং সামাজিক ভাষ্য দ্বারা চিহ্নিত তাঁর কবিতা। নির্ভয়ে জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা এবং সমাজ সংস্কারের বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করেছেন তাঁর অমর সাহিত্য কর্মে; মর্মস্পর্শী কবিতা দিয়ে পাঠকদের বিমোহিত করেছেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যসৃষ্টির মধ্যে রয়েছে "বিদ্রোহী", "রুদ্র মঙ্গল" এবং "ধুমকেতু" প্রভৃতি।

তা ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম একজন দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তাঁর নজরুল গীতির ভান্ডারে ২,৬০০ টিরও বেশি গান রয়েছে; যে গানের বিস্তৃতি প্রেম, প্রকৃতি, ভক্তি এবং দেশপ্রেম সহ কমবেশী মনুষ্য প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রে!

মধ্যবয়সে পক্ষাঘাত গ্রস্ত কবির কাব্যপ্রতিভা বিলুপ্ত প্রায় হলেও বাংলার প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণ রেখে বাংলাদেশে কবিকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় সমাঙ্গীন করা হয়।

“হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয় নাচে রে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে প্রথাগত বিদ্যালয়-শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি; গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেলজয়ী কাব্য রচনার পাশাপাশি একাধারে ছিলেন গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, চিত্রকর, নাট্যকার; এমনকি স্বরচিত নাটকে অভিনয় করেছিলেন বলেও অনেকের মুখে শুনতে পাই।

মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫২টি। তবে বাঙালি সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষত সংগীতস্রষ্টা হিসেবে। তাঁর কবিতার খাতায় প্রায় দু’হাজার বাংলা কাল জয়ী গানেরও সৃষ্টি - যার মধ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত অন্যতম! কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৬টি প্রবন্ধ-গদ্যগ্রন্থ এবং ৩৮টি নাট্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা “রবীন্দ্র রচনাবলী” নামে বত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত

হয়েছে। এছাড়া তাঁর সামগ্রিক চিঠিপত্র উনিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী “রবীন্দ্রনৃত্য” নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করে তাঁর অমর সৃষ্টি “সোনার তরী”র জন্য। বাঙালিয়ানার ভাবধারা ও নিজের ভাবনার প্রতিফলন করতে কবিগুরু শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন যা আজও বাঙালির অমূল্য রত্নসম্ভার। ঐক্যতান পরিবার আমাদের বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অপার অবদানকে এবং কবিগুরুকে স্মরণ করছে বিনম্র চিত্তে।

‘ওইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে’।

একটি জাতির আত্মা লোকজ সাহিত্য। এমন গভীর ভাবনা থেকে বলা যায়- জসীম উদ্দীন(১ জানুয়ারি ১৯০৩ - ১৪ই মার্চ ১৯৭৬) মূলত মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতার সাঁকো। যে সুতা ছিঁড়ে গিয়েছে সেই সুতা কিংবা দুটি প্রান্তের সংযোগ করতে চেয়েছেন।

জসীম উদ্দীন-এর কবিতায় পরিচয় পেয়েছে গ্রামপ্রকৃতির শান্ত-সুন্দর রূপসী বাংলার শ্যামল প্রকৃতির কথা, ভাটিয়ালী গানের সুর। জসীমউদ্দীন আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কবি।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় সহজ সরল পল্লী জীবনের শিল্প ভাষ্য প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর লেখা কাব্য-ভাব, ভাষা, চিন্তা, মুক্তি, শিল্পায়নের গভীরতা, ভাষা ও কাহিনীর বুনন, চিত্রকল্প, উপমায় তিনি সত্যিকারের জীবনশিল্পী!

জসীমউদ্দীন বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন যেগুলি তাঁর সৃজনী প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় বহন করে। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ হল- 'রাখালী (১৯২৭), 'নকশী কাঁথার মাঠ', (১৯৭৮), 'বালুচরা' (১৯৩৪), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪), 'ধানক্ষেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'সকিনা', 'ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে', 'মাগো জ্বালিয়ে রাখিস আলো'। তিনি কিছু অবিস্মরণীয় লোকগীতিও নির্মান করেছেন, বিশেষত ভাটিয়ালী ধারার। মানবতার মহান সাধক রূপে কবি জসীমউদ্দীন চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন, চিরকাল।

বাংলা সাহিত্যের উত্কৃষ্ট লেখকদের অবদান অমূল্য। তাদের লেখা গ্রন্থ সমাজে নতুন চিন্তাভাবনা এনেছে এবং সাহিত্যিক বিশ্বকে উন্নতির দিকে প্রেরণা দেয়। তাদের কৃতিত্ব সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আমরা তাদের সাহিত্যিক পথে অনুগামী থাকব। বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল তারকা আমাদের জীবনে নির্বিঘ্নে আলো প্রদান করে এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করে। তাদের অমর কৃতিত্ব সदा আমাদের মাঝে থাকবে, সাহিত্যিক চেতনাকে আরও উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে।

- কন্টেন্ট টিম (লেখক)
- সুস্মিত গুপ্ত ও রঞ্জিনী চক্রবর্তী (সম্পাদক)

নির্মিতা দত্ত



ছেলেখেলা

খেলাধুলার মত বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আর কিছু হতে পারে না। খোলা হাওয়ায় সবুজ মাঠে খেলাধুলা করার মতো স্বর্গ সুখ কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জগৎপারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা। এই খেলাময় মেলাই জীবন।

কানামাছি ভৌ ভৌ
যারে পাবি তারে ছৌ

বাঙালির খেলাধুলার মধ্যে কানামাছি একটি চমৎকার খেলা। বাংলাদেশের গ্রামীণ এ দেশের সর্বত্র শিশু কিশোররা এ খেলা খেলে থাকে। এটি খেলতে কোনো সরঞ্জাম লাগে না। শুধু এক টুকরো কাপড় আর কিছুটা জায়গা হলেই হয়ে যায়। এমনকি মাঠ, ছাদ বা ঘরের মধ্যেও খেলতে কোনো সমস্যা হয় না। শুধু ‘কানা’ যে হবে তাকে একটু হাঁটাহাঁটি করার যায়গা করে দিতে পারলেই অনেক নাহলে সে বেচারী ‘ঠুসঠাস’ গুঁতো খেতে থাকবে। কানামাছির ‘কানা’ মানে কিন্তু দিনকানা রাতকানা ধরনের কিছু নয়। দিব্যি চোখে দেখতে পাওয়া একজন মানুষ। কিন্তু খেলার শুরুতে যখন বটে নাওয়া হয়েছে, সেই পদ্ধতিতে সে ‘কানা’ নির্বাচিত হয়েছে। বটে নেওয়ার বিষয়টাও খুব মজার। বটতে হলে একটা ছড়া জানা চাই। ছড়াগুলোও খুব মজার। যেমন,

“আকাশ থেকে নেমে এলো ছোট্ট একটি প্লেন,
সেই প্লেনে বসে ছিল লাল টুকটুক মেম।
মেমকে আমি জিজ্ঞেস করলাম what is your name?
মেম আমাকে উত্তর দিলো, my name is,
সুস মি তা সেন।”

এবার শুরু হলো আসলে খেলা। তখন কানাকে এলোমেলো ঘুরিয়ে দিয়ে বাকিরা চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। কানার কাজ হলো অন্যদের খুঁজে বের করে স্পর্শ করা। এটা শুনতে যত সমস্যা মনে হচ্ছে আসলে এত সমস্যা হয় না। মজা করতে অন্য খেলোয়াড়রা একটু দূরে গিয়ে কানাকে ‘কানামাছি ভৌ ভৌ, যাকে খুশি তাকে ছৌ’

ছড়া কেটে ডাকও দেয়। কানা সেদিক দৌড় দেয়। এইভাবে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কানা যদি কাউকে ছুঁয়ে দেয় তবে কানার কানা হওয়ার পালা শেষ। যাকে ছোঁয়া হয়েছে সে নতুন ‘কানা’। এভাবে খেলা চলতে থাকবে যতক্ষণ খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে খেলায় ক্ষান্ত না দিচ্ছে। কানামাছি যখন খেলা হয় তখন বাচ্চাদের হুল্লোড় খিলখিল শব্দে জায়গাটা মুখর হয়ে উঠে। দৌড়া দৌড়ি তো আছেই। এমন মজার খেলা না খেলে কীভাবে থাকা যায় বলো?

এমন আরেকটি খেলা হচ্ছে লুকোচুরি। এটা শোনা মাত্রই সেই ছোটবেলার খেলাধুলার কথা মনে পড়ে যায়। দিনের পর দিন পেরিয়ে গেছে হাসি আড্ডা রঙ্গ রসিকতা ও লুকোচুরি খেলার মধ্যে দিয়ে।

“পেয়েছি! পেয়েছি!” - শব্দটির মধ্যেই কতটা যে আনন্দ অনুভূতি রঙ্গ রসিকতা কৌতুহল মিশে আছে তা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। লুকোচুরি সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা। খেলাটির আরোও একটি বিশেষত্ব জানেন কি? এই খেলার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুর প্রয়োজন হয়না। কয়েকজন একত্রিত হলেই মেতে উঠা যায় খেলায়।

লুকোচুরিতে একজন ব্যক্তি হল “অনুসন্ধানী” এবং অন্য সবাই “আড়ালকারী”। অন্ত্রেষণকারী তাদের চোখ বন্ধ করে এবং একটি সম্মত সংখ্যা গণনা করে - এক, দুই, তিন .. নয় দশ! গণনা শেষ হলে, সন্ধানকারী চোখ খোলে এবং বলে “প্রস্তুত হও বা না, আমি এখানে এসেছি” এবং খোঁজ শুরু হয়। আবার আরেকটা নিয়মে অনুসন্ধানী চোখ বন্ধ করে থাকে আর বাকিরা নিজের নিজের জায়গায় লুকানোর পর ‘ঠুক’ আওয়াজ করে। গ্রামের ভাষায় এই খেলাটাকে ‘ঠুকুরো’ খেলাও বলা হয়।

ডাংগুলি বাংলাদেশ ও উত্তর ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রামীণ খেলা। সাধারণত কিশোর বয়সী ছেলেরা এই খেলা খেলে। উত্তরভারতে এর নাম গোলি ডাঙা। ক্রিকেট আসার পর এর জনপ্রিয়তা অনেকটাই শ্রীয়মান হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে খেলাটি ড্যাংবাড়ি, গুটবাড়ি, ট্যামডাং, ভ্যাটাডান্ডা ইত্যাদি নামে পরিচিত। ডাংগুলি বাংলাদেশ ও উত্তর ভারতের অন্যতম আরেকটি জনপ্রিয় গ্রামীণ

খেলা। খেলার উপকরণ দু'টি- একটি দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা লাঠি (ডাং বা ডাঙা), অপরটি গুলি যা নামে গোল মনে হলেও গোল নয়, আসলে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা আরেকটি ছোট লাঠি যার দুই প্রান্ত কিছুটা সূঁচালো করা থাকে।

ডাংগুলি বাংলার সর্বাঞ্চলীয় একটি জনপ্রিয় খেলা। প্রধানত কম বয়সের ছেলেরা এটি খেলে থাকে; মেয়েরা সাধারণত ডাংগুলি খেলে না। দুই থেকে পাঁচ-ছয়জন করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে এটি খেলতে পারে। দেড় হাত লম্বা একটি লাঠি এবং এক বিঘত পরিমাণ একটি শক্ত কাঠি খেলার উপকরণ। প্রথমটিকে ডান্ডা ও দ্বিতীয়টিকে গুলি বা ফুত্তি বলা হয়। প্রথমে খোররলা মাঠে একটি ছোট গর্ত করা হয়। যারা দান পায় তাদের একজন গর্তের ওপর গুলি রেখে ডান্ডা মেরে সেটিকে দূরে ফেলার চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে থেকে সেটিকে লুফে নিতে চায়। তারা সফল হলে ঐ খেলোয়াড় আউট হয়, আর ধরতে না পারলে গর্তের ওপর রাখা ডান্ডা লক্ষ করে ছুড়ে মারতে হয়। ছোঁয়া গেলে সে দান হারায়, আর তা না হলে সে ডান্ডা দিয়ে তুলে গুলিকে আবার দূরে পাঠায়। তারপর গুলি থেকে গর্ত পর্যন্ত ডান্ডা দিয়ে মাপতে থাকে। সাত পর্যন্ত মাপের আঞ্চলিক নাম হলো: বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চাঘল, চাম্পা, বোঁক, মেক। এরূপ সাত মাপে এক ফুল বা গুট এবং সাত ফুলে এক লাল হয়। ভাঙা ফুলের ক্ষেত্রে যেখানে শেষ হয়, পরের খেলা সেখান থেকে শুরু হয়। বাড়ি, দুড়ি ইত্যাদি প্রতিটি মারের পৃথক পৃথক পদ্ধতি আছে। আউট না হওয়া পর্যন্ত একজন খেলোয়াড় খেলতে পারে, আউট হলে দ্বিতীয় একজন একই পদ্ধতিতে খেলবে। এভাবে সবাই আউট হয়ে গেলে বিপক্ষ দল দান পেয়ে খেলা শুরু করে। বস্তুত এ খেলাটি বর্তমান যুগের ক্রিকেটের গ্রাম্য সংস্করণ এবং ব্যাট ও বল ডান্ডা ও গুলির সমতুল্য। এক্ষেত্রেও ক্যাচ হলে অথবা ডান্ডার আঘাত করে আউট করার বিধান আছে।

ছেলেখেলা ছেলেবেলার স্বপ্ন। নামহীন অসংখ্য খেলা কবে যে একটা নাম পেয়ে যায় কে জানে। খেলতে খেলতে হাসতে থাকা, হাসতে হাসতে খেলা, কখনও যেন হয়না যেন শেষ তার বেলা।

- কন্টেন্ট টিম (লেখক)

- সুস্মিত গুপ্ত ও রঞ্জিনী চক্রবর্তী (সম্পাদক)

বাঙালির জলখাবার

জল ও খাবার দুইয়ে মিলে জলখাবার। জল বলতে নানা রঙের, নানা কোম্পানির শরবত । তাহলে খাবারটা কি! যা খেলে বার বার খেতে ইচ্ছে হয় সেরকম কিছু! দেখা যাক!

বাঙালি মানেই মিষ্টি, শীতকালে মানেই নলেন গুড়। নলেন গুড়ের রসগোল্লা মানে এক কথায় অমৃত। পায়ের, রসগোল্লা থেকে পৌষ পার্বণের পিঠেপুলি-নলেন গুড় ছাড়া গতি নেই ভোজনবিলাসী বাঙালির । প্রধানত কলকাতার গ্রামীণ উপকণ্ঠে চাষ করা এই গুড়ের মত তার তৈরি প্রক্রিয়াও আকর্ষণপূর্ণ। খেজুর গাছের গায়ে নল কেটে এই গুড় সংগ্রহ করা হয়, বলেই হয়তো একে নলেন গুড় বলা হয়। পাতলা, গাঢ় এই খয়েরি গুড় দিয়ে রসগোল্লা, পায়ের, ক্ষীর, পাটিসাপটা, আইসক্রিম ইত্যাদি অগণিত পদ তৈরি করা হয় যার মধ্যে একটি অসাধারণ মিষ্টি হল “জল ভরা” বা “তালশাঁশ সন্দেশ।” অনন্য স্বাদ এবং সুবাসের জন্য দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করা নলেন গুড় তৈরি করা কিন্তু আজ সংপ্রশ্নের মুখোমুখি।

‘হায় রে মজার তিলের খাজা খেয়ে দেখলি না মন কেমন মজা
লালন কয়, বেজাতের রাজা হয়ে রইলাম এ ভুবনে...।”

বাংলার যা কিছু একান্তই নিজের - এমন কিছু মুখরোচক খাবারের নাম বলতে গেলে “তিলের খাজা” অন্যতম। এটি তিল দিয়ে তৈরী একপ্রকার মিষ্টান্ন গোটা বাংলায় মুখরোচক খাবার হিসেবে সুপরিচিত। জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও দারুণভাবে এগিয়ে স্বল্পমূল্যের এই স্থানীয় খাবারটি। বৃহত্তর নদীয়া তথা বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলাকে তিলের খাজার আদি উৎপত্তিস্থল হিসেবে ধারণা করা হয় এবং সম্প্রতি বাংলার এ মুখরোচক মিষ্টান্ন বাংলার অন্যতম জিআই প্রোডাক্ট (গ্লোবাল ইন্ডিকেটর) এর মর্যাদা অর্জন করেছে; যা বাঙালি হিসেবে আমাদের সকলের জন্য গর্বের। বাংলাদেশের শহর-মফস্বল থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জেও এটি খুবই জনপ্রিয়। কিছুটা আঠালো ধরনের এই খাজার আকৃতি চ্যাপটা ও লম্বাটে ধরনের হয়। এর উপরে খোসা ছাড়ানো তিল মাখানো থাকে এবং ভেতরে খানিকটা ফাঁপা হয়ে থাকে। ঠিক কবে থেকে এই তিলের খাজার উৎপাদন শুরু এর সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। ইতিহাস

অনুসারে, অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া শহরে বেকারি পণ্যের জন্য পরিচিত দেশওয়ালী পাড়ায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাল সম্প্রদায়ের মানুষ এ খাবার তৈরি করতেন। কুষ্টিয়ায় ইতিহাস সন্ধানী কিছু মানুষের বিশ্বাস—১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে 'তেলি' সম্প্রদায়ের লোকদের মাধ্যমে এই খাবারটি প্রথম কুষ্টিয়াতে তৈরি হয়।

বাঙালির আরেকটি প্রাচীন খাবার হচ্ছে শুভ্ণো- একটি সুস্বাদু রুচিকর খাবার যা বাঙালি সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য খাবার। এটি সব শাকসবজির একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ। শুভ্ণো অথবা শুভ্ণুনি তিক্ত রসের এক ধরনের বাঙালি খাবার যা সাধারণত আহারের শুরুতে মুখসুন্ধি হিসাবে খাওয়া হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণে বেহুলার বিয়ের নিরামিষ খাবারের মধ্যে শুভ্ণোর উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যে এই রান্নাটির বহুবার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে 'শুভ্ণো' বলতে যেমন উচ্ছে, করলা, পলতা, নিম, সিম, বেগুন প্রভৃতি সবজির তিক্ত ব্যঞ্জনকে বোঝায়, প্রাচীনকালে তা ছিল না। একালের শুভ্ণোকে সেকালে 'তিতো' বলা হত। শুভ্ণো যে যে সব উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় সেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তিক্ত রসে রুচি বাড়ে। পলতা, নালতে, উচ্ছে, করলা, কচি নিম পাতা ইত্যাদি শুভ্ণোর তিক্ত রসের জন্যে ব্যবহার করা হয়। পর্ভুগিজরা বাংলায় আলুর ব্যবহার চালু করবার পর থেকে এটি শুভ্ণোর একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শুভ্ণোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটি তেতো, কিন্তু তাও খেতে খুবই সুস্বাদু। এর তিক্ততা বাংলা খাবারের সাদৃশ্যের একটি বর্ণনা।

বাঙালির জলখাবার এর কথা উঠলে মুরিঘন্টোকে বাদ দিলে কি করে চলে। বাংলার রান্না ঘরের ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থলে একটি খাবার রয়েছে যা গন্ধে, স্বাদে এবং ঘরে রান্না করা আরামের সারাংশকে মূর্ত করে: মুরিঘন্টো। এই সুস্বাদু খাবারটি বাঙালি রন্ধনশৈলীর একটি সর্বোত্তম অংশ, যা এর সরলতার জন্য উল্লিখিত হয় তবে সমৃদ্ধ স্বাদের হিসেবেও এ খাবার প্রতিটি রসনায় একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে। মুরিঘন্টো হল একটি একপদী খাবার যা মাছের মাথা, মসুর ডাল এবং বিভিন্ন মশলার সূক্ষ্ম স্বাদের সাথে ধরধরে ভাতকে একত্রিত করে। মুরিঘন্টো তৈরি করা নিজেই একটি শিল্পের রূপ, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি রান্নাঘরে চলে এসেছে। প্রতিটি পরিবার রেসিপিতে নিজস্ব কিছু বৈচিত্র্য যোগ করে, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপাদান এবং ব্যক্তিগত

স্পর্শগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা এটিকে সত্যিই বিশেষ করে তোলে। মুরিঘন্টো শুধু একটি খাবারের অনুষঙ্গ নয়; এর চেয়ে অনেক বেশি; এটি বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বাড়িতে রান্না করা খাবারের সাধারণ আনন্দের উদযাপন। অলস রবিবার বিকেলে পরিবারের সাথে উপভোগ করা হোক বা বন্ধুদের সাথে ভাগ করা হোক না কেন; এই প্রিয় খাবারটি মানুষকে একত্রিত করে এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরি করে যেখানে শেষ পাতের খাওয়া শেষেও এর স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রসনা তৃপ্তির জন্য মানুষ কত কি রাঁধে কতকিছু তৈরি করে। এজন্যই বলে পেট পূজা। জলখাবার বলতে আগে ছিল লুচি বেগুন ভাজা। আর এখন! নোনতা মিষ্টির হরেক রকম স্বাদে ভরপুর জলখাবার।

- কন্টেন্ট টিম (লেখক)
- সুস্মিত গুপ্ত ও রঞ্জিনী চক্রবর্তী (সম্পাদক)

গল্প

সেই অমানিশার বর্ষাঋত রজনীর বুকে কারা যেন ফকির লালন সাঁই এর গান তুললো।

“আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়
পাড়ে লয়ে যাও আমায়ে”।

বর্ষার হিম শীতল বাতাসের সাথে বাউলের ঝংকার যেন এক অলীক কল্পনার সূচনা করছিল। সেই কল্পনার প্রদেশে সম্মোহিতো মানব অকপট, ধরণীর প্রণয়োদ্দীপক আবেদনে জীবসমাজ আশ্বত। তমসচ্ছন্ন আকাশে- বাতাসে সে ধ্বনি আজ বিরাজোমান। এমনি এক রাতে নির্জীব হয়ে বসেছিল সজল। জানলার বাহিরের কৃষ্ণাভ আশমান যেন তাকে ডাকছে। মাতৃহীন ছেলেটির আজ মাতৃহ্রের অনুরাগ এবং স্নেহশীলতার অত্যন্ত বিহীনতা। কনীনিকার কোণে কিছু জামাট বাধা মর্মযন্ত্রণা যেন সরু নদীর মতো তার নিটল রক্তিম গাল দিয়ে ঝরে পড়ল। মা, তার শেষ অবলম্বন কে সে ধরে রাখতে পারেনি অঝোরে ঝরে শেষ হলো একটি প্রাণ। সিন্দুর, শাখা পলা পরিধানে সে বিদায় দিল তার মাকে। হতভাগ্য ছেলেটি দুটো ভালো কাঠ পেলোনা তার মার জন্য। সেই রাতে সে দেখেছে ভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রূপ।

হঠাৎ সজল দেখতে পেল সেই রাত্রির আকাশে একটি দীপ্তময় নক্ষত্র। তার মন আজ ও বলে, আজও প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সেই নক্ষত্র তার মৃত মা। মৃত্যুর ওপার থেকে তাকে দেখছে। মাতৃ প্রেম যেন সেই নক্ষত্রের দীপ্তির সাথে সমজাতিক সংমিশ্রণে একাকার

সজলের গ্রামটি সামগ্রিক ভাবে রমণীও এবং শোভাময়। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য যেন রঞ্জে রঞ্জে ফুটে উঠেছে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্র ও গাছের আলোড়ন, বৃহৎ মাঠ, কৃষকদের ভূমি চাষ, গ্রাম্য মহিলাদের জীবনযাপন, উন্মুক্ত মাঠ, সতেজ নদীর জল, কলহল মুক্ত বায়ু, কোন গ্রাম্য ব্যক্তির গাওয়া লোকগীতি প্রবৃত্তি দৃশ্য যেন মনে আনন্দের সঞ্চার করে।

ঋতুর বিধি নিয়ম মেনে আসে গ্রীষ্ম ,বর্ষা ,শরৎ, হেমন্ত ,শীত এবং বসন্ত । এমনই এক শরৎ কালে হল দেবী দুর্গার ধরাধামে আবির্ভাব । সে কি ললিত রূপ। দেবীর পদ্ম নয়নে যেন এক প্রগাঢ় উজ্জ্বলতা , প্রণয় ভজন স্মিতে যেন জগৎ প্রদীপ্ত। দেবীর শৃঙ্গার মকুটে সুশোভিত বিশিষ্ট নকশা । মাতৃত্বের প্রেমময় লাবণ্য যেন দেবীর আননে লাগানো, সে কি পরম অমায়িক ভালোবাসার প্রানস্বরূপ।

ঢাকের তালে আর শিউলি ফুলের সুগন্ধে চারিদিক মম সজলের ছোট পল্লী গ্রামে যেন দেবীর আগমন সার্থক সজনের তার মার মৃত্যুর পর এই মূর্তি গঠনের কাজে হাত দিয়েছিল সেকি ও দ্বিতীয় মেধা ছেলেটার তার নির্মিত প্রতিমা যেন জীবনের অন্বেষণ খুঁজে পায় তার এই প্রতিভা দেখে গ্রামের মোড়ল কে দেবী প্রতিমা তৈরি করার নির্দেশ দেয় আলোচনাক্রমে তাকে প্রদান করা হলো প্রতিমা তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম নদীর তীরে ছোট একটা ঘর আর কিছু কাঁচা-পয়সা সজলের মনে ভক্তি আর আর হাতে প্রতিভা দিয়ে আরম্ভ করলো কাজ

বন্ধ দরজার আড়ালে তার কর্মক্ষেত্র। বউলের তারে উঠে ঝংকার গলায় উঠে সুমধুর সুর তারা গায়

“মন রে আমার ডুবে আজ
তার প্রতীক্ষায়
স্মৃতির টানে মন
প্রেয়সির কাছে যায়”

স্মৃতি। স্মৃতির বলিষ্ঠ টানে আজও সজল সন্নিবদ্ধ। তাইতো বোধ হয় সেই মৃত্তিক প্রতিমা তে সে তার চিরন্তন হাস্যময় মার কোমল মুখমন্ডল ফুটিয়ে তুলেছিল। তার নির্মিত প্রতিমার অন্তরালে সে যেন পুনরায় খুজে পেয়েছিল মাকে। এক অপূর্ব অনুরক্তি যেন দুটো প্রাণকে আবদ্ধ করে রেখেছে, একদিকে মাতৃবিয়োগে কাতর ছেলে অপরদিকে মাটির প্রতিমাতে প্রতিফলিত হওয়া তার মা যেন এক নিবিড় বন্ধনে বাধা। সে পরম যত্নে প্রতিমা টিকে গরদের শাড়ি , রামধনুর বিচিত্র অলংকার , আরো কত স্নিগ্ধ সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল।

অপরদিকে পরিবেষ্টিত দরজার বাহিরে জনতার উৎসাহ আগ্রহ যেন দিন- দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারি মাঝে নানা গুঞ্জন হতে লাগলো। কেউ বললো, “ছোকরা টা ধান্দাবাজ না তো?” আবার কেউ বললো, “ছেলেটির হাতে এই কাজ না দিলেই ভালো ছিল মোড়ল সাহেবের”। কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করে বললো “এমন বলোনা ছেলেটির প্রতিভা আছে ও ঠিক পারবে”। এত সব জনশ্রুতির গুজবের মধ্যে সময়ের নিয়ম রীতি মেনে চলে এলো শরতের পূজো।

পঞ্চমীর দিন মহা উল্লাসে আনন্দে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হলো সজলের নিজেও গিয়েছিল তাদের সাথে। সে নাকি তার মাকে একা ছাড়বে না। তার এই শিশুসুলভ কথার কদর বা গুরুত্ব কেউ দেয়নি। তারা সেদিন বুঝতে পারেনি সজলের মনের কথা, তার এবং সেই প্রতিমার নিচ্ছদ্র বন্ধন তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। পূজো চলল পরম ভক্তি এবং শ্রদ্ধাতে। সারাদিনে সজল ততক্ষণ কিছু খেত না যতক্ষণ না তার মা খেয়েছে, তার চাহিদা খুবই সামান্য। প্রসাদের ক্ষুদ্র অংশতেই সে আনন্দিত। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধনুটি নাচ, আরো কত কি। সজল কিন্তু এইসবের ধার ধারতো না, সে প্রতিমাটির সামনেই বসে থাকতো অচল অবিচলিত ভাবে। সম্পূর্ণ দিনে সে ওই মন্দির প্রাঙ্গণে বসে থাকতো। কি এক কোমল নমনীয় দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকতো মূর্তিটির দিকে যেন প্রেম যমুনায় কেউ তাকে ডাকছে। সে যেন ফিরে পেল তার নিশ্চিহ্ন হওয়া সুসময়।

নিষ্ঠুর সময়ের হাত ধরে চলে এলো মার বিদায়ের বেলা সজলের শিশুবৎ মন যেন এই দিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল তার হাতে প্রণীত মূর্তিটিও একদিন ছেড়ে চলে যাবে বহু দূরে। প্রশমিত হবে জলে। তার মা কি আবারো তাকে ছেড়ে চলে যাবে?

দশমীর দিন। সবাই কেমন যেন সুখ-দুঃখের এক আজব মোহনায় দাঁড়িয়ে। সুখ? এই তো আর ৩৬৫ দিনের প্রতীক্ষা আর দুঃখ মায়ের বিদায়ের দুঃখ। বোধ হয় সজলের জীবনে যেন দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগ হতে চলেছে। অভাগা ছেলেটির কপালে যেন বিমর্ষতার রেখা দেখা দিতে লাগলো তার সৃষ্টি করা মা যে আজ জলে নিমজ্জিত হবে। সজলের বিষাদ ভরা ছোট হৃদয়টা আবার যেন দুঃখে কাঁদতে চায়।

তবুও সে শেষ চেষ্টা করেছিল। প্রথমে সে গেল প্রধান পুরোহিতের কাছে পরম ব্যস্ত পুরোহিত তাকে দেখে বলল, “কি হে, কি চাও বাপু?” রঞ্জন বলল, “ঠাকুরমশাই একটি আর্জি ছিল আপনার নিকট।” আমতা-আমতা করে সে বলল, “যদি প্রতিমাকে বিসর্জন করা না হয়, তাহলে কি কোন পাপ হবে?” এমন অদ্ভুত নিবেদন শুনে রীতিমতো ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “এসব কি বলছো তুমি বাপু! চলে যাও এখান থেকে”। দুখি মনে সে গেল মোড়লের কাছে। সিদ্ধির নেশায় নিমজ্জিত মোরাল তার কথা শুনে একপ্রকার কুৎসিত হাসি হেসে চলে গেলো। যেন সে তুয়াক্কাই করলো না সজলের কথা।

পর্যায় কালের হাত ধরে চলে এলো সেই মুহূর্ত। ডাকের শব্দে সর্বাদিক উদ্দীপিত। একে একে সবাইকে দেওয়া হলো বিসর্জন, দুর্গা প্রতিমা টি যখন উঠলো সজলের নয়নে বাধা পাওয়া কান্না যেন আর থামতে পারেনি, সহস্র ধারার মতো সেসব ঝরে পড়ে গেল। হৃদয়ের আড়াল করা পীড়া, ক্লেশ যেন বাধাহীন ভাবে বাহির হলো তার গলা দিয়ে। কি ব্রক কাতর মেশানো ধবনি দিয়ে বললো, “আমায় ছেড়ে যেও না মা।” নিষ্ঠুর সমাজ যেন তার এই কথা শুনতে পেল না কিন্তু মা ঠিক বুঝলো, তাইতো সেই মৃত্তিক প্রতিমার রূপটা কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। মা ও বুঝি কাঁদছে।

-শিব শংকর

Durga Puja: The Queen of All Festivals



India is a country of festivals. As a secular state, celebrations abound in this miraculous land. From Christmas to Eid Al-Fitr, from Independence Day to the World Cricket Championship, there is practically nothing that Indians don't like. Show us on one occasion and we are all for it. However, this long list of celebrations hides gems in the form of Durga Puja, which is celebrated with all its glory in the Bengali community. So, what exactly is Durga Puja?

mean exactly? Let us go back a few millennia to answer this question.

The tradition of invoking the goddess Durga (or mother, known as 'Ma') was first believed to have been carried out by Lord Ram before going to the Ravenna war, as documented in the epicenter of Ramayana. However, the tradition remained until the end of the 16th century, when the owners of Bengal accepted it. It finally got its final form in the 18th century as the Baroyaari (or 12 friends) pujas, a term that ultimately referred to the community-sponsored Durga Pujas in Calcutta.

The point is that all parts of India celebrates this time but in the form of Navratri. It consists of 9 days of fasting, ending with Dussehra, the day Ravenna's portrait was burnt to show that evil is always fought with good, as Lord Ram did for Ravenna.

In Bengal

However, in Bengal, the meaning of 10 days is very different.

My first memories of Durga Puja woke up in the middle of the night to hear Mahalaya on the radio. It's a program that has been airing on the first day of the Bengali Ashwin month for over 7 decades and 4 generations of Bengal, causing them to wake up at 4 a.m., which I still do religiously on that day every year. While the miracle of the scent, the semi-conscious ego, and the knowledge that Ma will come has diminished over the years, the idea of something so collectively powerful that the whole community hopes it still has a lot of charm.

Ma

We treat Ma Durga as more than a goddess. While it is true that she embodies the raw power (or shakti) that conquered evil by slaying the evil demon Mahisasur (hence the term Mahisasur-Mardini), it is MUCH MORE than that. A day starting with Mahalaya is visiting his father's house in Bengal with his four children every year. As such, Ma a deity.

To our Bengalis, she has created a reflection of our truthful nature. Wherever the Bengali is, come to Durga Puja, he feels connected with his family. This is what it means to celebrate puja (a slang term for Durga puja).

Frankly, it can't compare to anything in the world. But do you remember the friendliness you get when visiting family, the warmth of Christmas, or the feeling you get when visiting family after a year? It means Pujo for a Bengali. Celebrate more than just a religious holiday. The Pujo idea unites everyone. And how could there be a better way than a mother who made it all possible? We eat, we cry, we talk, we are happy and we celebrate something that is not found anywhere else in the world. It doesn't matter your religion. Whether you are Muslim, Hindu, Christian, Sikh, Jain, or anything in between (including atheists), if you are a Bengali, Durga Puja's heart is for you.

From visiting tens of thousands of emergency podiums (or pandas) to lifting Ma Durga for a cup of tea in the middle of the night (under a tree at a local store as it seems rain is inevitable during today's puja night, especially if you're around) At 2:00 a.m. for dancing during the Idol Immersion Ceremony (called Bhashan), Durga Puja is something you must experience at least one time in your life.

Oh, and did I mention the delicious Luchi and Khichuri for lunch during Ashtami and the beautiful women who adorn the pandas? Pujo is worth it ... trust me.

And it's all over

And once the puja is over, when we are all sad, we pray to the mother to return safely to the heavenly abode at the top of the Himalayas. This is how the waiting for the next puja begins. One more year to spend before our beloved mother returns. Since the puja never ends, it is only transferred within another year. After all, a mother is like a mother who wants you to be happy even if she leaves.

-Durjoy Adhikary

Attractions of Jodhpur



Jodhpur is one of the precious stones of Rajasthan. Located on the edge of the golden Thar desert, it is also known as the 'Blue City', as most of the houses are painted blue, near the Mehrangarh fort. The bright sun irradiates the city almost every day, so the city is also known as 'Sun City'. The city was founded by Rajput Rathore Rao Jodha around 1459 AD and is now the second-largest city in the state. Among the wide arms of the Aravali Mountains, this city is one of the best tourist destinations in the state with great forts, palaces, and monuments.

Mehrangarh Fort

Anyone who has visited Mehrangarh Fort will tell you the same thing: the time to fully embrace the masterpiece of architecture is at sunrise or sunset when the glow from the golden wall is just opposite the burning crimson sky. The combination of colors is almost incredible: the bright blue houses that surround the strong castle with the smell of incense and rose water, which is still more than five centuries old but stands 400 feet above the ground. Visit Mehrangarh for the cool feeling of standing on top of history and the incredible bird's eye view of Jodhpur.

Jaswant Thada

Just a short walk from Mehrangarh Fort you will come across Jashwant Thada, an ivory marble symbol made in the early twentieth century. A spectacular monument run by the royal family in memory of the second Maharaja Jashwant Singh silences the noise of a busy city around it, ignoring a blue-green lake from a considerable height. In addition to listening to the sound of the flute from inside the temple, to the amazement of fellow visitors in the chrysanthemum cenotaph, you will hear the most in Jashwant Thada..

Flying Fox Jodhpur

You don't have to go to the Amazon Rainforest for an air adventure – you can experience the comfort of Meherangarh Fort. The Flying Fox Jodhpur zipline tour is made up of a combination of six wires that stretch across the fort walls, taking you around the battlefields, lakes, and valleys of Jodhpur. Every flight comes with a guarantee of safety and comprehensive expertise on everything from the history of the fort to the spatial elements of Rajasthan.

Rao Jodha Desert Rock Park

A public park in 2006. After years of negligence, the area is overgrown with thorny bushes, turning it into a wasteland. Today 80 species of flowers are growing in the park, and an ancient aquarium called 'Gully' is now running peacefully throughout the park. Visitors come here for the chirping of the water and the chirping of the birds because you will not hear anything else in this quiet oasis.

Umaid Bhawan Palace

The Umaid building is a structured behemoth-turned-hotel that doubles as a living museum. In its original 1928 construction to preserve the iconic yellow sandstone, Renaissance-inspired cupolas, and Rajasthani towers, it gained cultural status as a luxury hotel. The more than 26 acres of magnificent gardens are adorned with plants that perfume the whole palace with the scent of roses and jasmine, and each night the palace is lined with well-lit lanterns scattered in the golden halo.

Santoshi Mata Temple

Santoshi Mata is an incredibly important goddess of the Hindu faith, known as the Mother of Contentment, and is included in the Santoshi Mata temple. Local devotees, especially women, often travel here to seek his blessings, especially as Friday is considered a special holy day for the contented mother. If you are here for less spiritual experience and more for aesthetics, you will not be disappointed. The temple is skillfully built from the Brown Stone, rising above the desert town.

Pukhraj Durry Udhyog

Pukhraj Durry Udhyog is a family-run carpet-weaving cooperative located in Salawas, a small village. The owner Chhotaram likes to give his visitors the gift of indomitable tours, even taking pictures with them after he continues to weave vibrant yarn together. Each blanket boasts a unique design, including an option for customization if you have specific colors and patterns for your little one. Prices are very affordable, but it is worth it for you to be able to return home a token of Jodhpuri heritage.

Mandore Gardens

The Mandor Gardens are less than four miles from the main part of the city, so there are very few tracks to visit this beautiful, pristine place. The gardens are dotted with stone-carved temples and the ruins of cenotaphs dating back to the 14th century. The calm and quiet atmosphere makes it the ideal place for an afternoon picnic with the family or an evening stroll with your partner; all you need to pay attention to is the 'Hanuman langur', an ironic term for monkeys.

Kaylana Lake

Lake Kaylana is not only a picturesque place in the expanse of blue-green waters; The city is mostly built on a desert which is why most of the people of Jodhpur drink their drinking water. As one of the largest reservoirs in Rajasthan, it is not surprising that Lake Kaylana has now become a tourist destination, where families often stop for pits for afternoon tea or lunch. There is always a cool breeze to greet your face while you are standing right on the water's edge.

Chamunda Mata Temple

Lake Kaylana is not only a picturesque place in the expanse of blue-green waters; The city is mostly built on a desert which is why most of the people of Jodhpur drink their drinking water. As one of the largest reservoirs in Rajasthan, it is not surprising that Lake Kaylana has now become a tourist destination, where families often stop for pits for afternoon tea or lunch. There is always a cool breeze to greet your face while you are standing right on the water's edge.

-Durjoy Adhikary



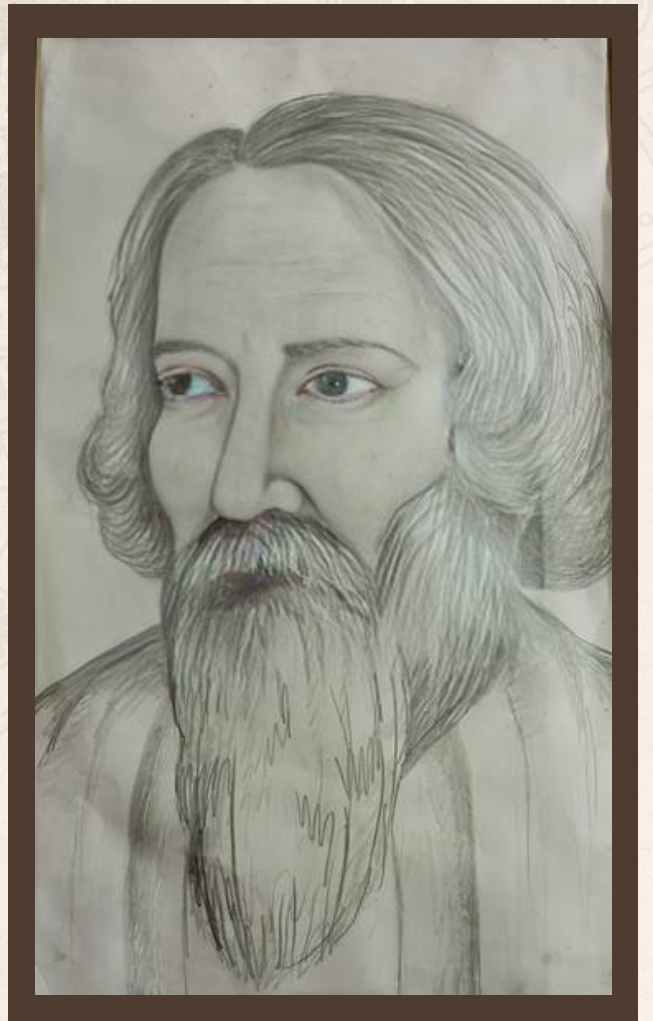
शिल्प

ART



ବନମାଳା ଡାକ୍ତରୀ

ଅମର୍ଜିତ ରାୟ





আলিউল ইসলাম



প্রিয়া দাস



সিদ্ধার্থ ঘোষ

সমজিৎ রায়





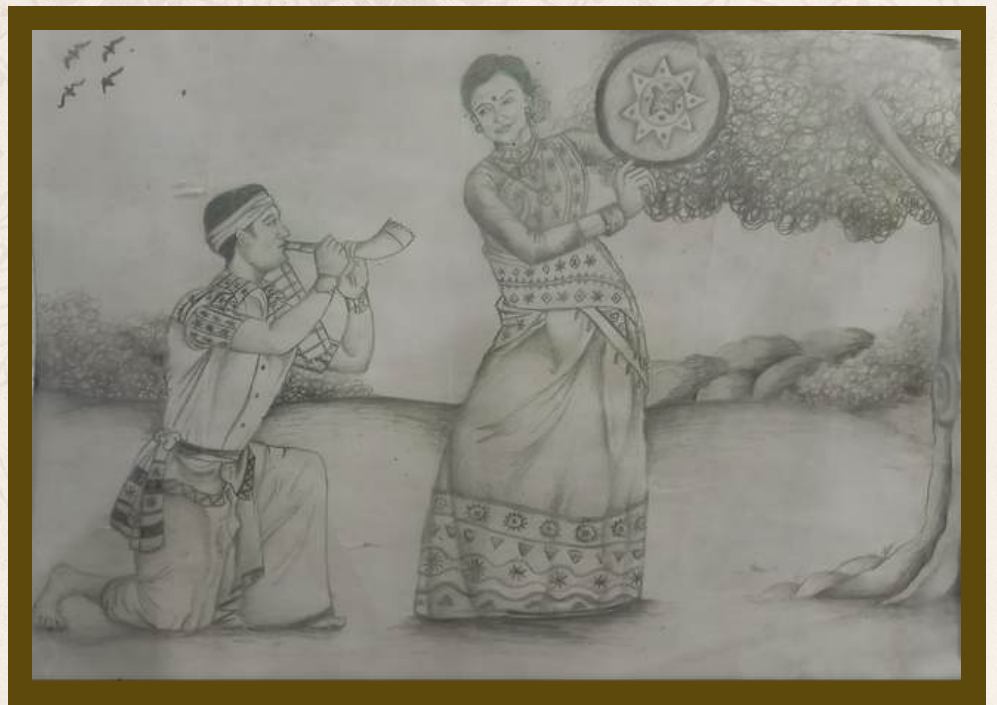
অমর্জিৎ রায়

অমর্জিৎ রায়

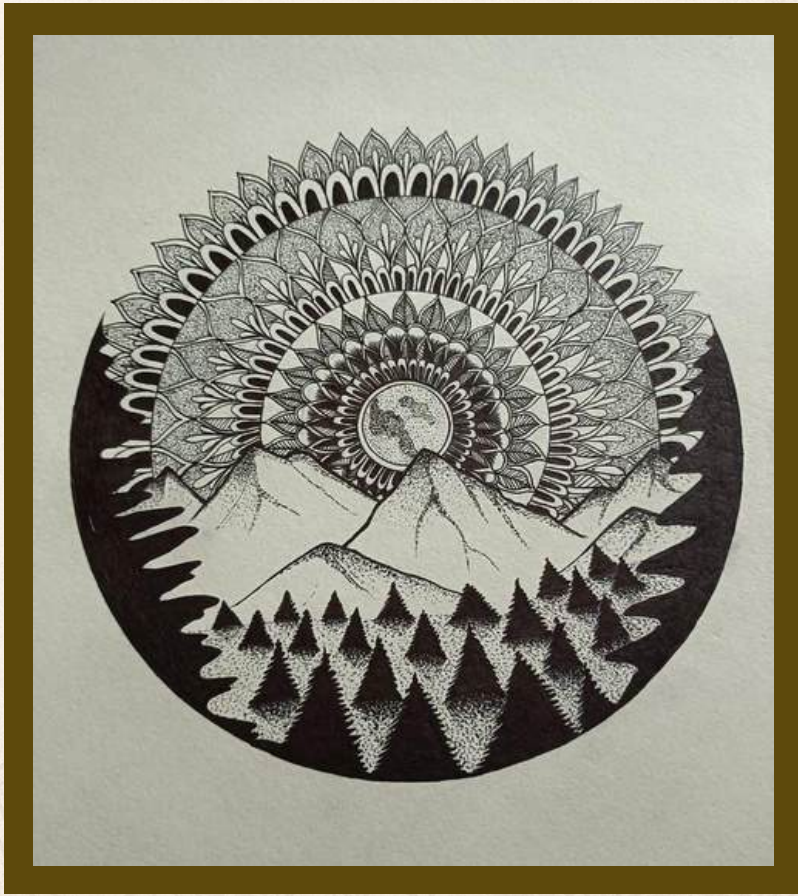




ଆଞ୍ଜଲି ରାୟ

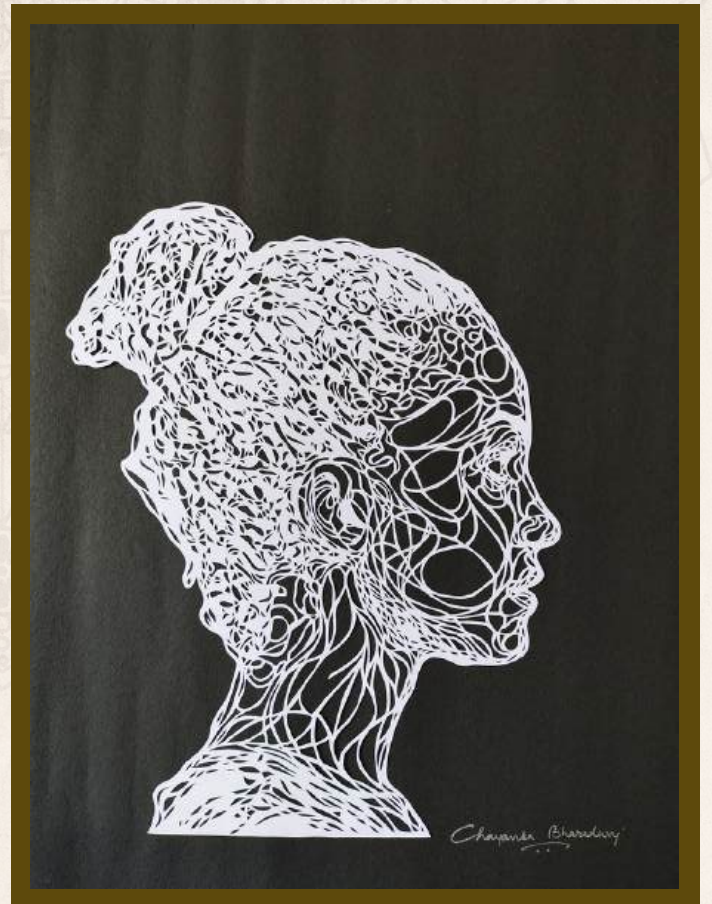


ଅମର୍ଜିତ ରାୟ



অনুষ্কা পাল

চায়ল্ড ভারদ্বাজ





আলিউল ইসলাম



আলিউল ইসলাম



নির্মিতা দত্ত



নির্মিতা দত্ত



সোমাদৃত হালদার

বর্নমালা

DESIGN TEAM



Anuj
B.Tech. 1st Year



Subrata Lodh
B.Tech. 1st Year



Anurag Debnth
B.Tech. 4th Year



Adrija
B.Tech. 1st Year



Amar Banik
B.Tech. 1st Year



Sourav Das
B.Tech. 3rd Year



Kritapungkha
B.Tech. 1st Year



Akshay
B.Tech. 1st Year



Nilanjana Dutta
B.Tech. 2nd Year

বর্নমালা

CONTENT TEAM



Jubair Protim
B.Tech. 4th Year



Pranto Das
B.Tech. 4th Year



Susmit Gupta
B.Tech. 3rd Year



Ranjini
B.Tech. 3rdYear



Amitabh Shrivastava
B.Tech. 3rd Year

